চিন্তন

বেদান্তে ভক্তি এবং জ্ঞান

স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ

[পূজনীয় লেখক মহারাজজী ছিলেন আমেরিকার সানফ্রানসিসকো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। তিনি গত ২ জুলাই ২০১৪ পঁচাশি বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর মুখপত্র 'বুলেটিন'-এর জুন ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'Devotion and Knowledge in Vedanta' প্রবন্ধের পরিমার্জিত রূপ এই রচনাটি। অনুবাদ করেছেন **প্রব্রাজিকা শুদ্ধাত্মপ্রাণা**।]

বেদান্ত এতই বিস্তারিত এবং গভীর যে, এ নিয়ে বলতে শুরু করলে কোথা থেকে আরম্ভ করব এবং কোথায় শেষ করব তা নির্ণয় করা কঠিন। বেদান্ত কী তা আমরা সারাজীবন ধরে বোঝার চেষ্টা করছি এবং সেইমতো জীবনযাপন করারও চেষ্টা করছি; তবুও দেখি তার অতি সামান্যই জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

বেদান্ত বিষয়টিকে দুটি উপায়ে বিচার করা যেতে পারে। একটি হল চরম সত্য—মূল কারণ থেকে শুরু করে আমাদের বর্তমান অবস্থায় নেমে আসা। অন্যটি—আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে শুরু করে চরম সত্য বা ব্রহ্মের দিকে এগোনোর চেষ্টা।

আমরা জানি আমরা কোথায় আছি; আমরা কেমন এবং আমরা কী। আমরা যেন বাসনা-ভয়, সুখ-দুঃখ—এরকম দ্বন্দ্বসমূহের এক-একটি সমষ্টি। সংক্ষেপে বলা যায়, আমরা শরীর-মন-জগতের একটি জটিল সমন্বয়। এখান থেকেই আমরা ধাপে ধাপে চরম সত্যে পৌঁছব। শাস্ত্র, আচার্য এবং অবতারগণের কাছে আমরা সেই সত্য সম্বন্ধে জানতে পারি। আমরা এক্ষেত্রে অনুমানেরও সাহায্য নিই। আপনারা সেই পরম লক্ষ্যকে ভগবান বা আত্মা বা যা ইচ্ছা বলতে পারেন। তবে এটা ঠিক যে, সেই লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতেই হবে।

প্রত্যেকের জীবনের মূল কারণ যদি সেই পরম সত্য হয়, তখন স্বতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমরা কেন তা অনুভব করি না। তবে কি আত্মা বা ব্রহ্ম শুধুই একটি কাল্পনিক তত্ত্ব বা ধারণামাত্র? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আচার্যগণ দৃঢ়নিশ্চয় করে বলেছেন যে এটিই আসল সত্য—সকল সত্যের সত্য, 'সত্যস্য সত্যম্'। আপনার এবং জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে এটি অভ্রান্ত সত্য। উভয়েই এক।

আমরা বুঝতে পারি, সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা কঠিন। আমি নিজেকে মনে করি দুর্বল, ক্ষুদ্র। মনে হয় আমার অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু শাস্ত্র সরলভাবে বলে, আমার প্রকৃত স্বরূপ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। আমি সর্বদা শুদ্ধ, মুক্ত এবং পবিত্র। তাহলে এর কারণ কী? শাস্ত্র বলে, তুমি যে

নিজের সম্বন্ধে ভিন্ন ভাব পোষণ কর সেটা একটা মানসিক সমস্যা, কখনই তা প্রকৃত সত্য নয়। এই সমস্যার কারণ অবিদ্যা অথবা অজ্ঞান। সেই কারণেই তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র বলে মনে কর। অবিদ্যা থেকে আসে অস্মিতা (আমিত্ব), যতরকম আসক্তি এবং সর্বোপরি যন্ত্রণা, সীমাবদ্ধতা—সমস্ত রকমের সমস্যা। এই সবকিছুর মূলে হল মন, যা এসব কিছুর সৃষ্টি করে। আমরা যাকে বন্ধন এবং মুক্তি বলি সেগুলি সবই মনের এক-একটি অবস্থা, যা এইসব সমস্যার সৃষ্টি করে।

আপনারা যদি 'How to learn to do things the right way', 'How to love', 'How to win friends', 'How to solve your problems' এ-ধরনের বইগুলি পড়েন, তাহলে দেখবেন বইগুলিতে এসব মানসিক সমস্যা বিষয়ে আলোচনা আছে। এগুলি আসে এবং যায়, কারণ এগুলি মানসিক। বেদান্তদর্শন অনুযায়ী, সমস্যাটি সত্য হলে তা কখনই চলে যাবে না। যদি আমার মাথা ব্যথা সত্য হয়, সে সম্বন্ধে কিছুই করা যায় না কারণ সত্যকে অতিক্রম করা যায় না। মাথা ব্যথা কিন্তু চলে যায়। সেইরকম আমাদের অধিকাংশ সমস্যাই কাল্পনিক ও কিছু সময় পরে মিলিয়ে যায়। উপনিষদের ভাষায় সেই সত্য হল, আমরা সবাই অমৃতের সন্তান—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—যা স্বামীজী জোর দিয়ে বলতেন। আমরা সবাই পবিত্র—এই-ই সত্য। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক আমরা এর বিপরীতটাই অনুভব করি। সুতরাং এ-ব্যাপারে অবশ্যই কিছু করা দরকার এবং সত্যিই করা যায়।

একটা গল্প বলি। একদিন এক ব্যক্তি নদীর ধারে বসে নদীতে ইতস্তত ভেসে যাওয়া নৌকাগুলি দেখছিল। হঠাৎ সে লক্ষ করল কতকগুলি নৌকা রাশীকৃত তুলো বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে। দেখামাত্র সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। অনবরত বলতে লাগল—''এত তুলো! কে এত তুলো কেটে সুতো তৈরি করবে?'' সে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে এ-প্রশ্ন করল। তার স্ত্রী সেই প্রশ্নের অর্থই বুঝতে পারল না। ধীরে ধীরে লোকটি কেমন একরকম হয়ে গেল। কোনও চিকিৎসক বা মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ তাকে সাহায্য করতে পারল না। কিছুদিন পর একজন ঘটনাটির আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনে একটা ফন্দি আঁটল। সে সোজা সেই লোকটির কাছে গিয়ে বলল, ''তুমি কি জান নৌকাগুলির কী হয়েছে? বিরাট অগ্নিকাণ্ডে সেই তুলোসহ নৌকাগুলি সব পুড়ে গেছে।'' সেই রোগী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ''তাই নাকি?'' সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং ভাল হয়ে গেল।

আমাদের সব সমস্যা প্রায় এইরকম। আমরা বিশ্বাস করতে না চাইলেও, যাঁরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং মনের গতিবিধি বুঝতে সক্ষম, তাঁরা বলেন সব সমস্যাই এরকম। গল্পের ওই আগুনকে আমাদের খুঁজতে হবে। ওখানে কোনও আগুনই ছিল না, কিন্তু তবু সেই কাল্পনিক আগুনই লোকটির ভয় ও উদ্বেগ দূর করে দিয়েছিল।

যাকে আমরা সাধারণভাবে যোগ বলি তা এই আগুনেরই মতো। এটি এমন এক পদ্ধতি যা ভুল ধারণা বা মানসিক সমস্যা অথবা অজ্ঞানকে দূর করে। বেদান্ত এই অজ্ঞানকে বলে অবিদ্যা, যা অনুভূতির পর অপসারিত হয়। সেই অনুভূতি তবে কী? আপনি অনুভব করবেন আপনি স্বরূপত কী। বিশেষ অসাধারণ কিছুই আপনার ঘটবে না। কখনও কখনও আমরা আচার্যদের জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মজ্ঞান হলে কী হবে? এর উত্তরে কোনও কোনও শাস্ত্র বলেন—তুমি স্বর্গলোক ইত্যাদি কোনও না কোনও লোকে যাবে। অদ্বৈত বেদান্ত সরলভাবে বলেন—ব্রহ্মজ্ঞান হলে তুমি তোমার স্বরূপ জানতে পারবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সমস্ত যোগের যথার্থ অভ্যাসের ফলেই এই অনুভূতি হয়।

যোগ চারটি—রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ। যাঁরা এই যোগগুলি অভ্যাস করে

আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছেন তাঁরাই এগুলির নামকরণ করেছেন। মার্গ বা উপায়ের নামানুসারেই যোগগুলি নামাঙ্কিত হয়েছে। যেমন, কৈবল্য বা মুক্তি হল রাজযোগের লক্ষ্য। প্রকৃতির জগজ্জালে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। আমরা যখন এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পাব তখন কৈবল্য বা অসঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হব। রাজযোগের উদ্দেশ্য এই অবস্থালাভ। যদি কোনও রাজযোগীকে প্রশ্ন করা হয় যে সত্যের উপলব্ধি কী, তিনি বলবেন—কৈবল্য বা মুক্তি।

আবার যদি কোনও কর্মযোগীকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে বলতে হয়, তিনি বলবেন মুক্তিই হল সার—সমস্ত আসক্তি থেকে, সকল কর্মের ফল থেকে মুক্তি। অপরদিকে ভক্তিযোগী বলবেন, সেই পরম উপলব্ধি হল পরম প্রেম। জ্ঞানযোগী বলবেন অনুভূতি হল আত্মজ্ঞান। সুতরাং আধ্যাত্মিক অনুভূতির অর্থ এসব কিছুই এবং আরও বেশি কিছু।

একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, বেদান্তে ভক্তির কোনও স্থান নেই এবং বেদান্ত বলতে কেবলমাত্র অদ্বৈত বেদান্তকেই বোঝায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য মরমিয়া সাধকগণ এই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত সত্য হল—বেদান্ত সবকিছুকে গ্রহণ করে, এটি ব্যাপক এবং অত্যন্ত গভীর। জনৈক লেখক লিখেছেন ভক্তিতে বা ভগবৎপ্রেমে ভক্তের ডাকে ভগবানের সাড়া দেওয়ার উপর এমনভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যেন দুজন ঈশ্বর আছেন; যদি একজন সাড়া না দেন তবে অপর জন আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন এবং তখন আমরা তাঁর সঙ্গে বাবা, মা, বন্ধু অথবা সন্তানের মতো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মা কালীর সঙ্গে কথা বলতেন আপনিও তেমনি ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। কথামৃতে দেখা যায় কতবার শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর সঙ্গে কথা বলছেন। এক জায়গায় তিনি মাকে বলছেন, ''এই যে মা এসেছ! আবার বারাণসী কাপড় পরে কি দেখাও।'' ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক কত বাস্তব! বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনা যেমন পূজা, মন্ত্রপাঠ, সর্বোপরি শরণাগতি—এসবের মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করা যায়। ভক্তিযোগের ভাষায় চরম আধ্যাত্মিক সাধনা হল 'আত্মনিবেদন'—নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে নিবেদন করা।

প্রশ্ন হতে পারে, এরপর কী? এর উত্তর হল, যখন কেউ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে তখন সে এই প্রশ্ন করে না। আত্মনিবেদন হল সর্বশেষ ধাপ। যখন আমি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন করব তখনই তাঁর কৃপালাভ করব। তারপর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়। ভক্ত একে পরম প্রেম বলে অভিহিত করে। এটাই তার ভাষা।

জ্ঞানীর কাছে সত্য অতীন্দ্রিয়। তাঁর পদ্ধতি হল অনুসন্ধান। তিনি বিচারবুদ্ধি, বিবেক এবং ধ্যানের সাহায্যে আত্মার অনুসন্ধান করেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিশেষ করে উপনিষদের শিক্ষা—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যের উপর মনকে একাগ্র করেন। তাঁর প্রধান গুরুত্ব থাকে আত্মপ্রচেষ্টার উপর। তিনি কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বারা সত্যকে এভাবে উপলব্ধি করতে চান যে, তিনি ব্রহ্ম স্বয়ং। অবশ্য এঁরা সকলেই স্বীকার করেন, অধ্যাত্মসাধনার জন্য একজন গুরু বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের কৃপা ও উপদেশ প্রয়োজন।

বহু জ্ঞানমার্গী সাধক মনে করেন ভক্তিযোগ অপেক্ষা তাঁদের পথই উৎকৃষ্ট। কখনও কখনও তাঁরা ভক্তদের নিয়ে উপহাস করেন। তাঁরা বলেন ভক্তেরা দুর্বল, কারণ তারা ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। জ্ঞানীরা এমন কথা বলেন কেননা তাঁরা আত্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বাসী।

অপর পক্ষও সমধিক বলিষ্ঠ। ভক্তেরা বলেন, এইসব জ্ঞানী ভালবাসা কাকে বলে তাই জানে না।

তারা খুব শুষ্ক, বাস্তববাদী নয়, কঠোরহৃদয়। তারা বলে ''আমি 'অহং' নই'', কিন্তু কখনও কখনও তারা উদ্ধতও হয়। এইভাবে ভক্ত এবং জ্ঞানীদের মধ্যে বিবাদ চলে আসছে। কিন্তু আমাদের আচার্যগণ সবসময়ে এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, জ্ঞান এবং ভক্তি পরস্পরবিরোধী নয়, তারা পরস্পরের পরিপূরক।

'আমি আত্মা'—গীতার উপদেশ এইভাবে আরম্ভ হয়েছে। তারপর যখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরবিরোধী নয়। তারা উভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

অপর একটি বিষয় হল বিশ্বাস এবং যুক্তি। ভক্তদের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন ঈশ্বর তাঁদের ভার নেবেন, তিনি কখনও তাঁদের পরিত্যাগ করবেন না। অপরপক্ষে জ্ঞানী বিশ্বাসকে তেমন মূল্য দেন না। যদি তাঁর বিশ্বাস থাকেও, সেই বিশ্বাস কিন্তু অন্যরকম। তাঁর বিশ্বাস আত্মা ও নিজের বিচারবুদ্ধির উপর। তিনি সৎ-অসৎ অথবা স্থায়ী-অস্থায়ীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়-প্রচেষ্টার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। শংকরাচার্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়; বিশেষত তাঁর স্তবস্তোত্রগুলিতে। আপনি যদি আত্মজ্ঞান চান তবে আপনি কীভাবে এগোবেন? আচার্য শংকর তাঁর অন্নপূর্ণাস্তোত্রে বলেছেন, জগজ্জননীর কাছে যাও। তিনি 'মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী'—মুক্তির দ্বার উন্মোচন করেন। সুতরাং সেই জননীর শরণাগত হও। 'ভবান্যষ্টকম্' স্তোত্রে শংকর বলছেন, 'গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি'—হে ভবানী, তুমিই আমার একমাত্র গতি। এইরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে জ্ঞান ও ভক্তি সহাবস্থান করছে। 'বিবেকচূড়ামণি'-তেও ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শংকর বলছেন, আত্মোপলব্ধির সকল উপকরণের মধ্যে ভক্তির স্থান সর্বাগ্রে। ভক্তি কী? 'স্বস্বরূপ-অনুসন্ধানম্'—আমাদের আত্মার প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা। সুতরাং ধ্যান এবং এই সমস্ত কিছুই হল ভক্তির অঙ্গ। শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ সকল আচার্যের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই সমন্বয়ভাবের বিশেষ প্রকাশ। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের প্রসঙ্গ করতেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ পুরীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং নির্বিকল্প সমাধিলাভ করেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশ ও সহযোগিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনা করতেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে সাবধান করেছিলেন যে, এভাবে বেদান্তচর্চা করলে তাঁর ভক্তি শুকিয়ে যাবে, তিনি তোতাপুরীর মতো শুকনো সাধু হয়ে যাবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এতে কর্ণপাত করেননি।

তোতাপুরী সত্যিই শুষ্ক ছিলেন। একদিন যখন শ্রীরামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে হরিবোল হরিবোল বলছেন, তখন অদ্বৈতবাদী আচার্য তাঁকে বললেন, ''রোটি ঠোকতে হো?'' শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, ''কী! আমি ভগবানের নাম করছি আর তুমি বলছ আমি রুটি ঠুকছি!'' তিনি এমনভাবে বলেছিলেন যে গুরু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সকল ভাবের মহান সমন্বয়কারী। তিনি দেখেছিলেন জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই সমান ফলদায়ক। ভৈরবী তাঁকে ভক্তি সম্বন্ধে যে-শিক্ষা দিয়েছেন তা অপূর্ব। তোতাপুরী তাঁকে নির্বিকল্প সমাধি বিষয়ে যে-শিক্ষা দিয়েছেন তাও সমভাবে চমৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন এ-দুটিকেই মেলানো যায়। স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী কালে বলতেন যে তাঁর গুরুর অন্তরে পূর্ণ ভক্তি ও বাইরে পূর্ণ জ্ঞান; এগুলির সঙ্গে একটি অধিক মাত্রা যুক্ত হয়েছিল—

মানব তথা সর্বভূতস্থ ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ সেবার মাধ্যমে প্রকাশিত ভালবাসা ও জ্ঞান।

অবশ্যই এ নতুন কিছু নয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অতিরিক্ত পঞ্চম পুরুষার্থের কথা ভাগবতে আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, এমনকী মোক্ষও চরম লক্ষ্য নয়। তাহলে পঞ্চম পুরুষার্থটি কী? সেটি হল সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন এবং তাঁকে প্রেমপূর্ণ সেবা নিবেদন। সেখানেই সব সমাপ্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ যেটির উপর জোর দিয়েছেন সেটি ভাগবতধর্মের সমজাতীয়, যাকে বলা যায় জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সেবা। জ্ঞান হল, প্রত্যেকেই ভগবান। যাকে তুমি ভালবাসছ ও সেবা করছ তিনি ভগবান ছাড়া আর কেউ নন। এইভাবে জ্ঞান ও প্রেম সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছে।

বেদান্তেও জ্ঞান এবং ভক্তি পৃথক নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-প্রসঙ্গে বলছেন, ঈশ্বরলাভের উপায় ও উদ্দেশ্য এই দুয়ের পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে। পথটা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। একজন যে-কোনও পথ অবলম্বন করে ঈশ্বরলাভ করতে পারে, সে ভক্তিপথেই হোক, জ্ঞানের পথেই হোক, কিংবা কর্মপথে অথবা রাজযোগের পথ অবলম্বনেই হোক। এই সবকটি পথই আছে। কিন্তু পথ শুধু পথই—উপায়মাত্র। লক্ষ্য ভগবানলাভ—যে অনুভূতিকে যে-কোনও নামে অভিহিত করা যায়। কেননা সেই অনুভূতিকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এই কারণে ভক্তি, জ্ঞান, মুক্তি ইত্যাদি সব নামগুলিই সঠিক। শ্রীরামকৃষ্ণ জোর দিয়ে বলছেন, আমরা যেন কখনই সেই অসীমের অনুভূতিকে সীমাবদ্ধ না করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবের বহু উদাহরণ দিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একটি পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে চিনির একটি দানা সংগ্রহ করেছিল। তারপর সে তার গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে যেতে যেতে ভাবল এর পরের বার গোটা চিনির পাহাড়টা নিয়ে যাবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু হিসাব করার জো নাই। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য! মানুষ মুখে কি বলবে?'' যখনই সেই উপলব্ধিকে আমরা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করি তখনই যত সমস্যা এসে জোটে। জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কলহের সূত্রপাত এই ঈশ্বরানুভূতিকে গণ্ডিবদ্ধ করার চেষ্টার জন্য। এইসব দৃঢ় অনমনীয় শ্রেণিবিভাগ চরম স্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি অথবা ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা, কৃষ্ণ, রাম অথবা অন্যান্য সকল অবতারগণ সম্পূর্ণরূপে একীভূত হয়ে যান। তখন আর কোনও সমস্যাই থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ অবদান হল বেদান্তের বিভিন্ন ধারার সমন্বয় সাধন। আধ্যাত্মিক সাধনার সময়ও তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন মতের সমন্বয় সাধন করা যায়; কীভাবে সেগুলি পরস্পরের পরিপূরক ও সাহায্যকারী হতে পারে। যদি বেদান্তের বিভিন্ন দিকগুলি সঠিকভাবে সমন্বিত করা না যায়, তবে ভক্তি শুধুমাত্র ভাবপ্রবণতা ও কাল্পনিক চিন্তায়, এমনকী গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হতে পারে। গোঁড়াদের মধ্যে যারা ধর্মের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তারা একদিকে খুব খাঁটি কিন্তু অপরদিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন। সেই কারণে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান এবং বিচারের প্রয়োজন।

স্বামীজী এখানে আর একটি পরীক্ষার কথা বলেছেন। সেটি এই : আপনি কি বৌদ্ধিক, মানসিক এবং নৈতিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছেন? আপনি ভক্ত, জ্ঞানী অথবা কর্মযোগী হতে পারেন, কিন্তু আপনার শক্তি কি বাড়ছে? যদি তাই হয়, তবে আপনি সঠিক পথে চলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এও বলতেন—ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? অনেক সময় আবেগ আমাদের বোকা বানায়। এমনকী অভ্যাসের স্তরেও বিচারশক্তির প্রয়োজন হয়—এটা

সত্য না কল্পনা অথবা স্থায়ী না অস্থায়ী তা জানবার জন্য। এসবই জ্ঞানী অভ্যাস করেন। সুতরাং অভ্যাসের স্তরে শুধু যে বিভিন্ন যোগগুলিকে সমন্বিত করা যায় তা নয়, উপরন্তু এ-ধরনের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারীও বটে।

আজকাল আমরা সবকিছুর পরিপূর্ণ সমন্বয় নিয়ে কথা বলি। যদিও চূড়ান্ত উপলব্ধিতে এসব কিছু মিশে যায় এবং তখন চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়। যার হয়, সেই ব্যক্তিকে ভক্ত বা জ্ঞানী অথবা উভয়ের মিলিত সমন্বয় বলে কোনও বিশেষ নামে চিহ্নিত করা খুব কঠিন। শংকরাচার্য, যিশু, আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস প্রমুখ মহাপুরুষ এবং মরমিয়া সাধকেরা এইসব ভাবকে মিলিয়েছেন। তাঁরা সকলেই মানবদরদি ছিলেন। পরম জ্ঞানী রমণ মহর্ষির পরিচিত ব্যক্তিরা বলেন, তিনি প্রায়ই আত্মসমর্পণের কথা বলতেন। সেটাই আত্মানুভূতি। মহর্ষির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি আবেগবিহ্বল হয়ে বলেছিলেন, তিনি কী প্রেমপূর্ণ ছিলেন। বাহ্যত তাঁকে একজন আদর্শ, কঠোর, সংযমী সাধক বলে মনে হত এবং তিনি সর্বদা জ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি ততোধিক ভালবাসায় পূর্ণ ছিলেন। অতএব এইসব মহাপুরুষের মধ্যে প্রেম ও গভীর জ্ঞান দুয়েরই একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্ত জ্ঞান, ভক্তি ও অন্যান্য যোগ এবং ধর্মের সমন্বয়ের উপর জোর দেয়। সুতরাং আসুন আমরা তাঁদের শিক্ষার অনুধ্যান করি। বেদান্তের নিয়ম হল শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। প্রথমে শুনতে হবে, তারপর চিন্তা করতে হবে এবং পরিশেষে গভীরভাবে ধ্যান করতে হবে। শুধুমাত্র তখনই সেটা আমাদের অঙ্গীভূত হবে।

আর একটি কথা আছে। সেটি হল ভগবৎকৃপা। কৃপা শব্দটি ভক্তিতে খুবই ব্যবহৃত হয়। একে ঈশ্বরের দান বলা যায়। কেবলমাত্র ধ্যান, মন্ত্রপাঠ, নৃত্যগীতের দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানলাভ করা যায় না। শুধুমাত্র এসবের দ্বারা ভগবানলাভ হয় না। এ একমাত্র তাঁর কৃপাতেই সম্ভব।

জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 'কৃপা' শব্দটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব? এ-বিষয়ে আমাদের সঙ্ঘের এক সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা আমাকে তৃপ্ত করেছে। তিনি বলেছিলেন, অপরিহার্য পবিত্রতা অথবা আত্মার অপরিহার্য প্রবৃত্তি হল কৃপা। সেই পবিত্রতা আমাদের মধ্যেই আছে। আত্মা হল ভালবাসা, আত্মায় তা পূর্ব থেকেই আছে, একেই আমরা বলি কৃপা। ঈশ্বরের কৃপা সবসময় আছে। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হল প্রেম, শান্তি, শক্তি—এ-সবকিছু আমাদের মধ্যেই আছে। শুধু দৃষ্টি উন্মুক্ত রাখলেই আপনি তা পাবেন। সেটা আছেই। আপনাকে তা সৃষ্টি করতে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।

সুতরাং এভাবে ভক্তি এবং জ্ঞানকে সংযুক্ত করা যায়। এ শুধু কথার কথা নয়। এগুলি হল আলোর উৎস। আপনি যাকে জগৎ বলেন তা শুধুই জগৎ নয়। এও স্বরূপত সত্য। সেটিই সকল মহাবাক্যের অন্তর্নিহিত মহাসত্য। ঈশ্বর অমৃতস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। এই সত্য অনুভবগম্য হয় তখনই যখন আত্মানুভূতি হয়। এই হল ব্যাবহারিক বেদান্ত। স্বামীজী বলেছেন ধর্ম হল অনুভূতি। যদি তা ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা না যায় তবে সেটা ধর্ম নয়। তাছাড়া যদি এটা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বিশেষ অধিকারী কয়েকজনের জন্য হয় তাহলেও তা ধর্ম নয়। ধর্ম প্রত্যেকের জন্য। এটিই বাস্তবসম্মত। কারণ তা হল আমার নিজের আত্মা; যা আমি অনুভব করতে পারি। এই আত্মানুভূতি আমার এবং প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। এভাবেই মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে বেদান্তকে উপস্থাপিত করেন। ভক্তি ও জ্ঞান আসলে একই আধ্যাত্মিক মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এরা অবিচ্ছেদ্য।